শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ একটি বিশ্লেষণ' নামক বইটির লেখকের অনুরোধে কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৮ সালে নিচের মুখবন্ধটি রচনা করেছিলেন। আমাদের মতো একটি পিছিয়ে পড়া অবক্ষয়িত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায়, যেখানে শাসকরা তমসাচ্ছন্ন চিন্তাভাবনা, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ফ্যাসিবাদী মানসিকতার বীজ উপ্ত করার উপায় হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে লাগায়, সেখানে প্রকৃত শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বর্তমান লেখাটি একটি তত্ত্বভিত্তিক পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিশ্বনাথ প্রসাদ সিংহ-এর এই ছোট অথচ সুচিন্তিত পুস্তিকাটির একটি ভূমিকা লিখতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি একথা কোনওমতেই অস্বীকার করতে পারি না যে, একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত যে কোনও ধারণা কখনওই শ্রেণীধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন যে, প্রতিটি সমাজের ভিতের পরিপূরক তার একটি উপরিকাঠামোও থাকে। একটি বিশেষ সমাজের অগ্রগতির একটা বিশেষ স্তরে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেটিই হচ্ছে সেই সমাজের ভিত। আর উপরিকাঠামো হচ্ছে, সেই বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূরক রাজনীতিগত, আইনগত, দর্শনগত, রুচিগত ও শিল্পগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই অনুযায়ী গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো। তাছাড়াও এই উপরিকাঠামোটি কেবলমাত্র পরোক্ষ, নিরপেক্ষ বা ভিতের উপর প্রভাব বর্জিত একটি নিষ্ক্রিয় শক্তি নয়। বরং বিপরীত পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল শক্তি যা সমাজের ভিতকে গড়ে তুলতে, সংহত করতে ও শক্তিশালী করতে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলেছে।

শিক্ষাব্যবস্থা যেহেতু একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরিকাঠামো সেহেতু একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এর ভূমিকা কখনই শ্রেণীনিরপেক্ষ বা শ্রেণীঊর্ধ্ব হতে পারে না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যে শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে সমাজের বস্তুগত ও ভাবগত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থনৈতিক ভিতের উপরিকাঠামো হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষমতাসীন সেই শ্রেণীর স্বার্থকেই পরিপূরণ না করে পারে না।

আমাদের সমাজ একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। কারও ভাল লাগুক আর না লাগুক, এটা একটা নির্মম বাস্তব সত্য যা আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। অতএব দু'টি শ্রেণী যেখানে ঐতিহাসিকভাবে পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় অবস্থান করছে সেখানে শিক্ষা সম্পর্কে কখনওই এমন একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি কারও থাকতে পারে না যা একই সঙ্গে উভয়শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে। এমতাবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি, দু'টি লক্ষ্য, দু'টি উদ্দেশ্য বা দু'টি প্রয়োজন সমাজে থাকতে বাধ্য। এর মধ্যে একটি পুঁজিপতিশ্রেণী তথা শাসক বুর্জোয়াগোষ্ঠীর রাজনীতি, আদর্শ ও স্বার্থকে রক্ষা করে, অপরটি রক্ষা করে শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতি, আদর্শ ও বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থকে। ফলে যদি কেউ শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের পক্ষে দাঁড়ান এবং তাদের কথা চিন্তা-ভাবনা করেন বলে দাবি করেন তাহলে শিক্ষা সম্পর্কে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যা সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থ, আদর্শ ও রাজনীতির পরিপূরক।

সুতরাং আমাদের মতো একটি পুঁজিবাদী সমাজে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রচলিত প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে ও সংহত হয়েছে সেগুলিকে নিরপেক্ষ এবং জনগণের মধ্যে 'বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার' ও শিক্ষার অগ্রগতির শ্রেণীনিরপেক্ষ হাতিয়ার বলে ফিলিস্টাইন বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে প্রায়শঃই প্রচার করে থাকেন, তা আদৌ সত্য নয়। সমাজে নিরন্তর যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে তার পটভূমিতে বিচার করলে একথা সহজেই ধরা পড়ে যে, এগুলো কোনওমতেই শ্রেণীনিরপেক্ষ নয় বা শ্রেণীঊর্ধ্ব কোনও সত্তাও নয়। এগুলি হল শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণের বিপ্লবী মতাদর্শ ও চিন্তাপদ্ধতির

উপর আক্রমণ চালাবার সুনির্দিষ্ট শ্রেণী-হাতিয়ার।

স্বভাবতঃই শিক্ষাপ্রণালী ও তার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে লেখক তাঁর পুস্তিকায় যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন সেটা আমাদের দেশের বর্তমান প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোনওমতেই অর্জন করা সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের বা জাতিগত অত্যাচারের কোনও প্রশ্ন থাকবে না, সেখানেই এগুলো বাস্তবায়িত হতে পারে।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যতদিন না আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারছি ততদিন আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকব এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য গুরুত্ব সহকারে কোনও প্রচেষ্টাই চালাব না। বরং আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উচিত, শিক্ষাকে সহজ লভ্য করা এবং প্রকৃত অর্থে শিক্ষাকে সার্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ করাই শুধু নয়, জীবনের গণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য সুদৃঢ়ভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করা। সুতরাং আমাদের দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচি যা দীর্ঘদিন যাবৎ অপূরিত হয়ে আছে তা পূরণ করা, অর্থাৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্য জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করাই হবে আমাদের দেশের শিক্ষাসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

আমরা সকলেই জানি যে, ভারতীয় পুঁজিবাদ এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে গড়ে উঠেছে। যে জাতীয় বুর্জোয়ারা এদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা আগাগোড়াই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করেই ক্ষমতাসীন হয়েছে। এর ফলে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি সম্পূর্ণ করতে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী, নানা উপজাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নানা সম্প্রদায়গুলির সম্পূর্ণ একীকরণ ঘটিয়ে একটি জাতিতে পরিণত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এখানে আরও একটি কথা সবসময় মনে রাখতে হবে, তা হল, পুঁজিবাদের অধীনে জনসাধারণ শুধু যে অর্থনৈতিকভাবেই শোষিত হয় তাই নয়, তাদের উপর ন্যাশনালিটি অপ্রেশনস-ও (উপজাতি নিপীড়ন) চলে। এই কারণে যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে একাধিক ন্যাশনালিটি বিদ্যমান সেখানে সর্বত্রই আজও আমরা দেখতে পাই প্রভাবশালী ন্যাশনালিটি অন্য ন্যাশনালিটি বা ন্যাশনালিটিগুলিকে দমন করে চলেছে। আমাদের দেশের সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্র থেকেও খুব সুস্পষ্টভাবেই এর নজির মেলে। রাজনৈতিকভাবে আমরা একটি জাতি হিসাবে গড়ে ওঠা সত্ত্বেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করলে আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের একটি সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ও জাতপাতকে কেন্দ্র করে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে আছি।

আমাদের দেশের জনগণের ঐক্য গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। অথচ এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কার্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে রাষ্ট্রের দ্বারা সকল ধর্মকে সমান উৎসাহদান। এজন্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের ও তদানীন্তন র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী আন্দোলনের নেতাদের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য! বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষতার যথার্থ অর্থ এটা নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থ হল সমস্ত রকমের অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতি। একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, এবং রাজনীতি, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত রেখে ধর্মকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে গণ্য করে এবং এইভাবে ধর্মকে তার যথার্থ জায়গায় স্থাপনা করে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যারা ধর্মে বিশ্বাসী ও যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয় উভয়েই সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কারও ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করা বা আঘাত না করা এক জিনিস, আর কারও ধর্মীয় মানসিকতায় উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। সুতরাং কারও ধর্মবিশ্বাসে যেমন উৎসাহ দেওয়াও নয়, আবার বাধা দেওয়াও নয় — এইটাই একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কোনও মতেই এরকম হতে পারে না যে, সরকার সকল ধর্মকে সমানভাবে সমর্থন করবে। কিন্তু কংগ্রেস, মেকি কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের কল্যাণে আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে এক অদ্ভুত ধারণা গড়ে উঠেছে যার অর্থ হচ্ছে সকল ধর্মকে সমান উৎসাহ দান। এইরূপ পরিস্থিতিতে ধর্মান্ধতা বাড়িয়ে তোলা ছাড়া আমরা আর কী আশা করতে পারি! তাছাড়া এই মতের প্রবক্তারা কী একবারও ভেবে দেখেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি সকল ধর্মে সমান উৎসাহ দান বোঝায় তাহলে বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্তান ও

ভারতের মধ্যে পার্থক্য এই জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে, প্রথমটি যদি ইসলামিক ধর্মীয় রাষ্ট্র হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি একটি বহু ধর্মীয় রাষ্ট্র।

সমাজজীবনের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হলে 'গণতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' বলে যাঁরা চিৎকার করছেন তাঁদের অবশ্যকরণীয় কর্তব্য হওয়া উচিত ছিল সর্বপ্রথমে শিক্ষাকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। কিন্তু এই প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ বিপরীতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার একটা প্রবণতা সম্প্রতি আমরা লক্ষ করছি। এর ফল হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির স্বার্থকে খুব ভালভাবে রক্ষা করা। ধর্মীয় ঐতিহ্যবাদের কাছে এভাবে আত্মসমর্পণ করায় গণতন্ত্রের সমস্ত ঘোষণা বাস্তবে ফাঁকা আওয়াজে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় আমাদের দেশের এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে সংকীর্ণতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতপাতের প্রতি যে একটা সুস্পষ্ট ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তা আশ্চর্যের কিছু নয়।

তাছাড়াও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত অধিকতর সঙ্কুচিত ও অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যে অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষার দাবি উঠেছিল তার বিরুদ্ধে বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রবল আঘাত এসেছে। শিক্ষার মান উন্নত করার দোহাই দিয়ে এমনকী বর্তমানে শিক্ষার সুযোগ যতটুকু আছে তাকেও সঙ্কুচিত করা হচ্ছে, বিশেষত উচ্চশিক্ষার সুযোগ ক্রমশ কমানো হচ্ছে। শিক্ষাকে ক্রমাগত অধিকতর ব্যয়বহুল করে তোলা হচ্ছে যার ফলে আরও শিক্ষাসংকোচন ঘটছে। অন্যদিকে যেসব বিষয় ছাত্রদের বিশ্বের জটিল সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে এবং মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে সেইসব বিষয়ের প্রতি যাতে অনীহা সৃষ্টি হয় সেইভাবেই পাঠক্রম তৈরি করা হচ্ছে। শ্রেণীদৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ সত্য উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন নয় যে, হিউম্যানিটিজ অথবা বিজ্ঞান যাই হোক, সকল শাখাতেই পাঠক্রম এমনভাবে নির্ধারিত হচ্ছে যাতে শিক্ষার মর্মবস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র কারিগরি দিকটির উপরেই জোর পড়ে। যেমন দেখা যাচ্ছে, একজন ইতিহাসের ছাত্র কিছু ঘটনাপঞ্জীর বিবরণে বা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা থেকে বেরিয়ে আসছে কিন্তু মানবসমাজের অগ্রগতির অন্তর্নিহিত নিয়মের ভিত্তিতে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কীভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও সংযোজিত করতে হয়, সেই সৃজনশীল জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছে না। বিজ্ঞান শিক্ষার চিত্রও এর থেকে ভাল নয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যুক্তিধারা, ন্যায়নীতি ও দর্শনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ছাত্রদের কেবলমাত্র কারিগরি জ্ঞান গড়ে তুলতেই সাহায্য করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ আমরা অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে লক্ষ করছি যে, আমাদের দেশের বিজ্ঞানের বেশিরভাগ ছাত্র, এমনকী যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে এসেছে তারাও, জীবনে নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সেগুলো সম্পর্কে একটা সুশৃঙ্খল বিজ্ঞানসম্মত বিচারধারা গ্রহণ করতে পারে না।

ন্যায়নীতিবোধের ন্যূনতম ধারণা গড়ে না ওঠার দরুন ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সামাজিক যে কোনও সমস্যার প্রতি চরম অনীহা ও ঔদাসীন্য ক্রমাগত বাড়ছে। ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও সুশৃঙ্খল যুক্তিধারা গড়ে তোলার পরিবর্তে অধ্যাত্মবাদ ও কারিগরি বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাজীবনে এই ঝোঁকটি বাস্তবিকপক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এ হচ্ছে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটিকে কাজে লাগায়, কিন্তু ন্যায়নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে সমস্ত রকম বিজ্ঞানবিরোধী বস্তাপচা ধর্মীয় সংস্কার মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত বিচার বিশ্লেষণের মানসিকতা গড়ে ওঠার পরিবর্তে তমসাচ্ছন্ন ভাবধারা, অন্ধবিশ্বাস ও মনগড়া ধ্যানধারণা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে, এবং শেষপর্যন্ত মানুষের মধ্যে সামাজিক বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত অনীহার মনোভাব সৃষ্টি হয় ও মানুষ তার সামাজিক ভূমিকা হারায়। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই সমস্ত লক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, ফ্যাসিবাদ আমাদের সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করছে।

যুবসম্প্রদায়ের প্রতি সুনাগরিক হওয়ার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সমস্বরে উপদেশবাণী বর্ষণ করা এবং অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে সমস্ত মনীষীদের জন্মোৎসব পালন করা সত্ত্বেও আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, হীন

স্বার্থপরতা, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি চূড়ান্ত অনীহা কীভাবে যুবসমাজের প্রাণসত্তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে? কয়েক বছর আগেও বিদেশি শাসনের আমলে যে যুবসমাজ জাতীয়তার আবেগে টগবগ করত, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসত, আজ সেই যুবসমাজের মধ্যেই কেন নৈতিক অধঃপতনের এই কুৎসিত রূপ দেখা যাচ্ছে? আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই বর্তমানে অধঃপতিত ও বিকৃত হয়ে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না। আসলে সাধারণভাবে দেশের পরিবেশ এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থাই নৈতিক মানের এই অধঃপতনের উৎস। সুতরাং আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মূল কারণটি অনুসন্ধান না করে যদি যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেকার হীন স্বার্থপরতা, নৈতিক অধঃপতন ও সমাজ সম্পর্কে চূড়ান্ত অনীহা দেখে আমরা শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করি তাহলে আমরা কার্যকরী কিছুই করতে পারব না।

মানবসমাজের বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে যে দর্শন, যে আদর্শ এবং মূল্যবোধের যে বিশেষ ধারণা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে, সমাজবিকাশের ভিন্নতর পর্যায়ে তাই আবার প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ারে ও সুবিধায় পর্যবসিত হয়ে যায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগে যে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে আমরা তুলে ধরেছিলাম তার ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস ঘটেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া মানবতাবাদের আদর্শ প্রিভিলেজ (অন্যায় সুবিধা) ছিল না। তখন সেটা সমাজিক স্বার্থের সঙ্গে মূলগতভাবে মিশে গিয়ে ঐতিহাসিকভাবে একটি প্রগতিশীল বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠার পরই জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের ধারণা তার প্রগতিশীল ও বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। জাতীয়তাবাদী হতে হলে আজ আর কোনও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া মানবতাবাদ আজ শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে প্রিভিলেজ-এ পর্যবসিত হয়েছে এবং সমাজের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ আজ সর্বহারা শ্রেণীস্বার্থের সাথে এক ও অভিন্ন হয়ে মিশে গিয়েছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধারণা ও জাতীয়তাবাদ আজ আর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রতিফলিত করে না, বরং তা আজ মূলত দেশের প্রগতিশীল ও বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, গোটা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যে আদর্শ ও মূল্যবোধের পতাকাকে আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলাম এবং সেদিন যা প্রগতিশীল ও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, আজ তা শাসক বুর্জোয়াদের হাতে প্রিভিলেজ-এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেই অর্থে তার ভূমিকাও নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে।

তাছাড়া, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাধিগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। দেশের ছাত্র যুবকদের মধ্যে ন্যায়নীতি বোধ এবং সেই অর্থে সামাজিক কর্তব্যবোধের কোনও ধারণাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে না। সর্বাগ্রে সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে, তারপর আসবে নিজের অধিকারের প্রশ্ন — এইটাই নীতিবোধের গোড়ার কথা হওয়া উচিত।

বর্তমানে আমাদের সমাজ আদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। আজ সমাজে এমন এক নতুন দর্শন ও আদর্শের প্রয়োজন যা দেশের যুবসমাজকে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম। একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শই বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার পথ দেখাতে পারে। এই আদর্শই একমাত্র পারে দেশাত্মবোধের সাথে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের সংযোজন ঘটাতে। কারণ সমাজবিকাশের বর্তমান পর্যায়ে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশাত্মবোধই সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম। সমস্ত ধরনের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের সংগ্রামের এ এক অমোঘ আদর্শগত হাতিয়ার। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই হল একমাত্র দর্শন যা সমস্ত ধরনের প্রিভিলেজ ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শেখায়, যা মানুষকে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করে। একমাত্র এই দর্শনই অবক্ষয়কে রোধ করে জনগণের নৈতিক মানকে উন্নত করতে পারে। তাই জনগণের নৈতিক মানকে উন্নত করার জন্য যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের কথা ভাবছেন, পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৃহত্তর পটভূমিতেই তা তাঁদের ভাবতে হবে। নাহলে এ প্রশ্নের কোনও উত্তরই তাঁরা খুঁজে পাবেন না যে, নেতৃবৃন্দের এত উপদেশের বন্যা ও এত এত কমিশন বসানো সত্ত্বেও কেন যুবসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মান ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে চলেছে।

পরিশেষে আবার বলতে চাই, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচিকে রূপায়িত করার প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা বর্তমান যুগে এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী রূপায়িত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে ভারতবর্ষের গণমুক্তি অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত সর্বহারাশ্রেণীর আদর্শ ও রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষা এবং নীতিনৈতিকতার প্রশ্নকে সংযোজিত করাই আজ দেশের বিপ্লবীদের, প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্দের মহান কর্তব্য। উপরোক্ত প্রশ্নগুলি গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য পাঠকদের কাছে আমি একান্তভাবে অনুরোধ করছি।

শ্রী বিশ্বনাথ প্রসাদ সিংহ রচিত
'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ একটি
বিশ্লেষণ' নামক পুস্তিকার মুখবন্ধ।
১৯৬৯ সালের ২১শে মে
দলের ইংরেজি মুখপত্র প্রোলেটারিয়ান এরা-তে
প্রথম প্রকাশিত হয়।